বুদ্ধদেব বসু কালের কষ্টিপাথর

জাকির তালুকদার

'যেগুলো সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা, এগুলো যে হঠাৎ এক জায়গায় এসে বিশেষ হ'য়ে ওঠে, যেন তুলনাহীন, এইটেই শিল্পপ্রক্রিয়ার মূল রহস্য। জীবনের অতি সাধারণ তথ্যের রূপান্তর ঘটে সেখানে; তারা অর্থ পায়, দ্যোতনা পায়, দূরস্পর্শী ইঙ্গিতে আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা যখন সাহিত্য পড়ি তখন আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের তথ্যগুলিকেই চিনতে পারি সেখানে কিন্তু ঠিক সেগুলোকেও নয়। সেই সব তথ্য, যা বাস্তব জীবনে অস্পষ্ট, এলোমেলো, যোগসূত্রহীন, কিংবা অভ্যাসে পরিজীর্ণ, সেগুলোকে যেখানে সুসংবদ্ধ রূপে দেখতে পাই, স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ করে উপলব্ধি করি, তাকেই আমরা বলি আর্ট, বলি শিল্পকর্ম। এমন প্রবল তার সংঘাত, এমন নিবিড় তার প্রভাব আমাদের মনের উপর, যে হাজারবার জানা কথাটাও নতুন লাগে। সেখানে, মনে হয় যেন এ-রকম কিছুই হয়নি, যেন এই প্রথম এটাকে দেখতে পেলাম, চিনতে পারলাম। অর্থাৎ শিল্পীর যেটা নিজস্ব এবং বিশেষ দৃষ্টি, তার অংশীদার হ'য়ে তবেই আমরা সাধারণকে চিনতে পারি।...কিন্তু তথ্যের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি যুগপৎ সম্ভব নয়, ঘটনাকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে হ'লে ঘটনা থেকে সরে যেতে হয়। এই মানসিক অপসারণের জন্য শিল্পীর চাই অনাসক্ত দৃষ্টি; মানুষ হিসেবে সাধারণ সুখদুঃখ সকলের সঙ্গে সমানভাবেই তিনি ভোগ করবেন, কিন্তু তিনি যখন শিল্পী, তখন ঐ মানবভাগ্যের অন্তর্গত হয়েও তাঁকে দেখতে হবে যেন বাইরে থেকে, বলতে হবে এমনভাবে যেন তিনি অংশভাগী না; অর্থ বোঝার জন, অন্বয়সাধনের জন্য তাঁকে তখনকার মতো হবে হবে মনের দিক থেকে আত্মস্থ, আত্ম - সম্পূর্ণ। আর এই স'রে যাবার, স'রে দাঁড়াবার প্রয়োজন থেকেই তাঁর স্বাধীনতার উদ্ভব— শিল্পীর পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ সেই স্বরাজ; যতক্ষণ যতটুকু তিনি শিল্পী, ততক্ষণ এবং ততটুকুই স্বতঃসিদ্ধ।' (শিল্পীর স্বাধীনতা', সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধদেব বসু)

সাহিত্য বা শিল্পের মধ্যে তিনি কী কী দেখতে চান এবং শিল্পীর কাছ থেকে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করেন, তা জানতে হলে ওপরের উদ্ধৃতি যথেষ্ট। এখান থেকেই তাই প্রায় পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় সাহিত্য - সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর মানস - প্রবণতার সূত্রপথ। প্রারম্ভিক যৌবন থেকে যে - মানুষটি, সজ্ঞানেই বলা চলে, নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন আধুনিক সাহিত্যের দিকে ছুটে আসা সকল চক্র - বর্শা - তীর, যিনি প্রায় এক মেধায় প্রতিহত করেছেন, অভিমন্যুর মতো যিনি বিপক্ষের সপ্তরথীর ব্যূহে একা প্রবেশ করেছেন এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সকল সারথিকে যিনি নিজের সবটুকু আনুকূল্য দিয়ে নিরন্তর ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠতে সহায়তা করেছেন, তাঁকে অবশ্যই সাহিত্যের সমকালীন সকল প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত থাকতে হয়েছে নিবিড়ভাবে, যাতে তিনি দ্বিধাহীন গ্রহণ - বর্জনের পথ বেছে নিতে পেরেছেন নিজেকে কষ্টিপাথরে পরিণত করে।

প্রসঙ্গত যে - প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল, বুদ্ধদেব বসুর প্রকৃত পরিচয় কী? তিনি কবিতা লিখেছেন, গল্প - উপন্যাস লিখেছেন, নাটক - কাব্যনাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন অজস্র, পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, গ্রন্থ প্রকাশক হয়েছেন, অনুবাদ করেছেন অসংখ্য বিদেশি রচনা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাহলেও, আমার বিশ্বাস, বুদ্ধদেব বসু মূলত কবি। সম্ভবত তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজেও এই একই উত্তরই দিতেন, যদি তাঁকে যে - কোনো একটি পরিচয় বেছে নিতে বলা হতো তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে 'কবি' অভিধাটিকেই বেছে নিতেন। তিনি যে মনে মনে নিজেকে কবিই ভাবতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তিনি নিজে ছিলেন নির্জনতা প্রিয়। কন্যা রুমিকে চিঠিতে লিখছেন— 'বিবিক্ত হতে না পারলে নিজের ভেতরকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। একা থাকা, একা বসে ভাবা, কোনো একটি দাবিদার কাজে লিপ্ত হ'য়ে থাকা— এসব যার ভাগ্যে ঘটেনি, সে জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ জানে না।' স্নেহের পাত্র নরেশ গুহের কাছে লেখা চিঠিতেও একই সুর— 'আর এরকম নিঃসঙ্গতা আছে—সেটা কবির নিঃসঙ্গতা। যদি মনেপ্রাণে সাহিত্য রচনাতেই লিপ্ত থাকো, তাহলে পরিণত বয়সে তার স্বাদ পাবে। সেটাও দুঃখের, সে দুঃখ বেঁচে থাকার গভীরতা বাড়ায়।'

এই যে নির্জনতাপ্রিয় কবিপ্রাণ, তাঁকে কেন আজীবন ভিড়ের মধ্যে কাটাতে হয়েছে সংগঠকের ভূমিকায়? কিংবা কবির চেয়ে তাঁর মূল্যায়ক - সমালোচক পরিচয় কেন বড় হয়ে উঠল? কবিরা তো লেখেন কম, ভাবেন বেশি বা পাঠ করেন বেশি। অথচ কেন তাঁকে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ —এই কুড়ি বছরের মধ্যে লিখতে হয়েছে অন্তত পঁচাশিটি বই? পরবর্তীকালে কেন ১৯৫১ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ছেষট্টিটি বই? কেন তাঁকে প্রায় প্রতিদিন 'সকাল ন-টা সাড়ে ন-টায় শুরু করে—দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের চা বাদ দিয়ে—রাত আটটা পর্যন্ত একনাগাড়ে লিখে যেতে হত? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ফিরে যেতে হবে বুদ্ধদেব বসুর সমকালে। উত্তর খুঁজতে হবে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের, কখনো কখনো ব্যক্তিজীবনেরও ঘাত - প্রতিঘাতে।

[দুই]

এমন এক কাজের গুরুভার নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, যার জন্যে লেখক-জীবনের শুরু থেকেই নিজে বুদ্ধদেব বসুকে যেমন বিতর্কিত হতে হয়েছে, তেমনই বিতর্কে যোগ দিতেও হয়েছে অসংখ্যবার।

বদ্ধুদেব বসুর জন্মস্থান কুমিল্লা। জন্মতারিখ ১৯০৮ সালের ৩০ নভেম্বর। মাতা বিনয়কুমারীর তিনিই প্রথম ও শেষ সন্তান। কারণ তাঁর জন্মমুহূর্তেই ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মাতা। মাতৃহীন এই শিশু বেড়ে উঠলেন অসম্ভব মেধাবী হিসেবে। নোয়াখালিতে স্কুলের পাঠশেষে কিশোর বুদ্ধদেব বসু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন ঢাকায় এসে। অধিকার করলেন প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান। ইন্টারমিডিয়েটে আর্টস থেকে প্রথম বিভাগে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, এবং এমএ পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান। এমন জ্যোতিষ্মান ছাত্রজীবন সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাননি। কারণ ওই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পদ্মপারের গন্ধ! ফলে এক পর্যায়ে তাঁর জীবিকার একমাত্র উপায় ছিল লেখালেখি।

লেখা অন্তপ্রাণ বুদ্ধদেব বসুকে ভালোমতো চেনা গেল কল্লোল - কালিকলম - প্রগতি পত্রিকার পাতায়। ১৩৩৩ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর গল্প 'রজনী হ'ল উতলা'। গল্পটির পাঠ - প্রতিক্রিয়ার আত্মশক্তি পত্রিকায় বীণাপাণি দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন— 'এমন লেখককে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল।' অনেক পরে নবশক্তি পত্রিকায় এই মর্মে অভিযোগ উঠেছিল যে, এই গল্পটি স্টেফান জোয়াইগের গল্প থেকে চুরি (!) করা। অভিযোগ ধোপে টেকেনি। কারণ 'রজনী হ'ল উতলা'র প্রকাশকাল ১৯২৬, আর জোয়াইগের গল্পের প্রকাশকাল ১৯৩১। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম উপন্যাস সাড়া যখন প্রগতির পাতায় ধারাবাহিকভাবে

ছাপা হচ্ছিল, তখন কেউ কেউ এটিকে চিহ্নিত করেছিলেন 'অশ্লীলতার দুঃসহ নির্দশন' রূপে। কেউ কেউ উপন্যাসে খুঁজে পেয়েছিলেন ইডিপাস কমপ্লেক্স, কেউ কেউ অজাচার।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অশ্লীল লেখক বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করায়। ১৯৩১ সালে বিচিত্রা পত্রিকায় 'নবীন কবি' নামক ছোট একটি লেখায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— 'সম্প্রতি দিলীপকুমার (রায়) কয়েকটি কাঁচি - ছাঁটা পাতায় আপন মন্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ করে বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সম্পূর্ণ দেননি। যে - কয়টি ও যতটুকু পাওয়া গেল পড়ে খুশি হলুম।... এই রচনাগুলি জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াস দেখা যায়। সে-দুর্লক্ষণ না দেখে আরাম পেয়েছি। কবিতাগুলিতে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য ছন্দে ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্যশালী।'

বুদ্ধদেব বসুর রচনা - সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত পত্র - পত্রিকার এবং অভিজাত মহলের অভিযোগের অন্ত ছিল না। তাদের মতে; বুদ্ধদেব বসুর রচনা প্রথমত এবং প্রধানত অশ্লীল ও রুচিবিগর্হিত; সেইসঙ্গে আছে পদ্মাপাড়ের ভাষার গ্রাম্যতা এবং ইংরেজি ভাষারীতির অনুসরণ। এবার তার সঙ্গে যোগ হল রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রশংসাপ্রাপ্তির মতো মহা অপরাধ। এতটা সহ্য করতে নারাজ অভিজাতদের সাহিত্যপত্রিকা শনিবারের চিঠি। সেখানে সজনীকান্ত দাস বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসা করার অপরাধে রবীন্দ্রনাথকে ভর্ৎসনা করে লিখলেন— 'নবীন কবিটির সম্বন্ধে তিনি যে ঐকান্তিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন সেই উচ্ছ্বাসের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইবার চেষ্টা, অর্থাৎ তাহার কবিতাগুলির একটুকুও পরিচয় এই লেখার কোনওখানে নাই, আছে কেবল সাফাই ও কৈফিয়ৎ—অতিরিক্ত বিনয়ের মণ্ডনে সেই সে কৈফিয়ৎও বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে।'

অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় প্রশংসা করায় আসামিয় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল এমনকী রবীন্দ্রনাথকেও। বুদ্ধদেবের প্রতি এতই বিতৃষ্ণা তৎকালীন সাহিত্যের কর্তাব্যক্তিদের।

রাজনীতিগত কারণেও বুদ্ধদেব বসুকে সইতে হয়েছে অনেক বিরোধিতা। ১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হলে তাতে যোগ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। লিখেছিলেন 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' কিংবা 'সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি'র মতো প্রবন্ধ। পরবর্তীকালে উপরোক্ত সংঘ এখন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ নামে কমিউনিস্ট পার্টির প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ শুরু করে, দলীয় রাজনীতিতে যোগ দিতে অনীহ বুদ্ধদেব বসু সংঘ থেকে বেরিয়ে গেলেন। এর ফলে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে শুরু হল তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করার যুদ্ধ। এই সময় সরোজ দত্ত 'ছিন্ন করো ছদ্মবেশ' প্রবন্ধে লিখছেন— 'বুদ্ধদেববাবুর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' কিছুদিন পরে হিরণকুমার সান্যালও লিখলেন প্রায় একই ধরনের আলোচনা— 'ইতিহাসকে যারা উপেক্ষা করে ইতিহাস তাদের মনে রাখে না। কবিতার চৈত্র সংখ্যায় (১৯৫১) বুদ্ধদেববাবুর 'পশ্চিম' কবিতাটি পড়ে মনে হল রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় অনুকরণ আরো কুড়ি বছর আগে হয়তো এতটা অসহ্য মনে হত না। আরো মনে হল, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথে বুদ্ধদেব বসুর স্বচ্ছন্দবিহার আর বেশিদিন সম্ভব হবে না, তাঁর পদস্খলন আরম্ভ হয়েছে, অতঃপর বিশেষ সাবধান না হলে নিজেকে সামলানো দায় হবে।'

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য ও সাহিত্যালোচনা নিয়ে বিতর্ক আগে থেকেই চালু ছিল। বামপন্থীরা এবার আরো তোড়জোড় শুরু করলেন বুদ্ধদেব বসুকে নেহাতই সাহিত্য - বোধহীন প্রমাণ করতে। বিনয় ঘোষ এই সময় বাংলা সমালোচনা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় বুদ্ধদেব বসুর রচনায় দেখিয়েছিলেন আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি এবং স্বার্থপর গোষ্ঠীনিন্দা ও গোষ্ঠীপৃষ্ঠপোষকতা। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু যখন বাংলা কবিতা নিয়ে ইংরেজিতে **অ্যান একর অফ গ্রিন গ্রাস** বইটি লিখলেন তখন বিষ্ণু দে পর্যন্ত দলীয় রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে বুদ্ধদেব বসুর 'শুদ্ধ সাহিত্যবাদ' ও যে কীরকম ভারাক্রান্ত, তার লক্ষণাভাস দেওয়া যে সাহিত্যিক কর্তব্য সে-বিষয়ে সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

বুদ্ধদেব বসুকে রবীন্দ্রবিরোধী বলে পরিচিত করানোর একটি চেষ্টা বিভিন্ন মহলে থেকেই চালু ছিল। সে-কাজে যোগ দিলেন বামপন্থীরাও। রবীন্দ্রনাথ - বিষয়ে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সেই প্রবন্ধের সূচনায় তিনি উদ্ধৃতি হিসেবে তুলে দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম য়োরোপীয় সাহিত্য লেখেন' বাক্যটি। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দে-র নেতৃত্বে প্রকাশিত হল প্রতিবাদপত্র। সেখানে লেখা হল—'বুদ্ধদেব সম্প্রতি বোদলেয়ার র‍্যাঁবো প্রভৃতি কবিদের লেখা পড়তে শুরু করেছেন— ভালো কথা, কিন্তু অস্থানে-কুস্থানে এই নবীন উৎসাহের জ্ঞানের প্রয়োগ বিশেষ করিয়া ফরাসি দেশে বা আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়োগে আমরা ব্যথিত।'

এত ভারী ভারী ডিগ্রি ও পদবিধারী মানুষ বুদ্ধদেব - বিরোধিতায় নেমেছেন; এত বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা আক্রমণ করেছেন বুদ্ধদেবকে, তাঁদের সঙ্গে বাদ - প্রতিবাদে, আত্মরক্ষার খাতিরেও প্রচুর লিখতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর বোদলেয়ার - অনুবাদ যে কতটা অনির্ভরযোগ্য তা দেখানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন ফরাসিবিদ বাঙালি পণ্ডিতরা। হোল্ডারলিন ও রিল্‌কের কবিতার অনুবাদ নিয়ে তো কথা উঠেছে আমৃত্যু। এমনকী মেঘদূতের ভাষান্তরই বা কতটুকু নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বয়ং ছন্দোগুরু প্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি তো সরাসরি মতামত দিয়েই ফেলেন যে, বাংলায় মন্দাক্রান্তা ছন্দের ব্যবহারে বুদ্ধদেব বসু চরমভাবে ব্যর্থ। বুদ্ধদেব বসুকে বিনা কারনে লিখতে হয়নি কবিতার শত্রু ও মিত্র বইটি।

যেহেতু সাহিত্য ছাড়া আর কিছু বিবেচ্য ছিল না বুদ্ধদেব বসুর, তাই সাহিত্যের শিল্পমূল্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন। রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের মননশীল ও হার্দ্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন কেবলমাত্র আবু সয়ীদ আইয়ুব। রবীন্দ্রনাথের একটি কাজে বিশেষভাবে কষ্ট পেয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত বাংলা কাব্য পরিচয় সংকলনটি দেখে। এই গ্রন্থের কবি- নির্বাচনে অমনোযোগিতার প্রতিক্রিয়ায় বুদ্ধদেব বসু কবিতা পত্রিকায় লিখলেন—'বিষ্ণু দে 'বাংলা কাব্য পরিচয়' -এ অনুপস্থিত। এ থেকে আমরা এই বুঝব যে, বিষ্ণু দে-র কবিতা রবীন্দ্রনাথের একেবারেই ভালো লাগে না, এবং তাঁর লেখার মধ্যে তিনি কিছুই খুঁজে পাননি। বনফুল, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, হাসিরাশি দেবী, সুকোমল বসু প্রভৃতির কবিতা রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে, বিষ্ণু দে-র কবিতা লাগে না। এই কি তবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত রুচি? কথাটা বিশ্বাস করবার মতো নয়, কিন্তু না করেই বা উপায় কী?...সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নবীন লেখনী' নিশ্চয়ই তাঁর বাল্যকালের রচনা, সেটি এবং আর একটি কবিতা (যা ভালোই, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের যোগ্য নয়) সংযোজিত করে 'কর্কেস্ট্র' ও 'ক্রন্দসী'র লেখককে সাধারণ পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথ কেন যে হাস্যকর করলেন সেটা সত্যি বুঝতে বুঝতে পারলুম না।... এছাড়া, জীবনানন্দ দাসের (দাশ?) 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় যে-রকম বেরোয় তাই কিছু কেটেছেঁটে রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন। অঙ্গহানিতে কবিতাটির ক্ষতি

হয়েছে।...সাহিত্যক্ষেত্রে কেউ কারুর কৃপাপ্রার্থী নয়। দয়া গ্রহণের চাইতে স্পষ্ট উপেক্ষার বর্জন অনেক বেশি সম্মানের।'

এ-সম্পর্কে পরবর্তীকালেও বুদ্ধদেব বসু আমাদের কবিতাভবনে লিখেছেন—'একদিন বেরোলো বিশ্বভারতী থেকে 'বাংলা কাব্য পরিচয়' আমাদের জন্য গভীরতর নৈরাশ্য নিয়ে, এমন একটি নিশ্চরিত্র সংগ্রহ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক। ...যেহেতু কবিতা আমি ভালবাসি এবং রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয়, তাই 'কবিতা'য় একটি আলোচনা আমার লিখতেই হল—প্রতিকূল বলেই বহুবিধ যুক্তি সহকারে বিস্তারিত। সংখ্যাটি বেরোনো মাত্র কাটা গেল আমাদের বিশ্বভারতীয় বিজ্ঞাপন—কিন্তু আমি রইলাম এবং এখনো আছি অনুতাপহীন, ভাবলে আমার এখনো মনে হয়, সেই প্রেমের - কবিতাবর্জিত গদ্যকবিতারহিত পাঠ্যবইগন্ধী সংকলনটি জ্যোতিষ্মান রবীন্দ্রনাথ নামের নিতান্তই অযোগ্য।'

এভাবে তথাকথিত ও সত্যিকারের প্রতিভাবান ও খ্যাতিমানদের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে নিজের সৃজনশীল লেখার পাশাপাশি নিজের সাহিত্যবোধেরও নিরন্তর বিকাশ ঘটাতে হয়েছে বুদ্ধদেব বসুকে। তবে লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, তাঁর বিপক্ষে মন্তব্য করলেও, এমনকী সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলেও নিজের কাব্যসাথিদের বিরুদ্ধে কখনই কলম, ধরেননি বুদ্ধদেব বসু। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে-র বিরুদ্ধে কখনই কলম ধরেননি বুদ্ধদেব বসু। যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে-র বিরুদ্ধে কখনই দাঁড়াননি তিনি। এঁদের যে-কোনো জন সম্পর্কে সাধারণভাবে তাঁর মনোভঙ্গি ছিল এমন—'কী এসে যায় তুচ্ছ মতভেদে যখন তিনি এত ভালো কবিতা লিখছেন!' তাহলে বুদ্ধদেব বসুকে দাঁড়াতে হয়েছিল কাদের বিরুদ্ধে? বুদ্ধদেব দাঁড়িয়েছিলেন কাদের বিরুদ্ধে? তাঁর নিজের ভাষায়—'দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিল সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লন্ডনে - পাশ - করা প্রোফেসার, আর কেউ ফরাসি জার্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন।' প্রতিতুলনায় প্রায় একাকী বুদ্ধদেব বসু। 'কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ্য কথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পঙ্‌ক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে', সম্ভবত সেই কারণেই এই অসম দ্বন্দ্বে বুদ্ধদেব বসু হেরে যাননি। হেরে যাবার ভয়ে কুরুক্ষেত্র থেকে এক পা-ও পিছু হটেননি। আর আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষায় সবচেয়ে মননশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ সমালোচক, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যাখ্যাতা বুদ্ধদেব বসুকে।

[তিন]

কালের পুতুল কেন লিখতে হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুকে? সমকালীন কবিদের মূল্যায়নের দুঃসাহসী পথে কেন তিনি পা বাড়ানোর দায়িত্ববোধ অনুভব করেছিলেন নিজের মধ্যে? (সাহিত্যচর্চা বইটি সম্পর্কেই একই প্রশ্ন তোলা যায়)।

লিখতে হয়েছিল; কেন না এই দূরুহ পথে পা বাড়ানোর সাহস পান না প্রায় কেউ-ই বুদ্ধদেব বসুর নিজের জবানিতে একটি উত্তর পাওয়া যায়—'পণ্ডিতো, অধ্যাপকেরা সমকালীন সাহিত্যকে তাঁদের অনুশীলনের বহির্ভূত রেখে নিরাপত্তা খোঁজেন। আর সংবাদপত্রাদিতে রিভিউ লেখেন যাঁরা, তাঁরা এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে নিরঙ্কুশ এবং—দুঃখের বিষয় -সাধারণত সবচেয়ে নির্বোধ। আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি এ-বিষয়ে একটি নীরক্ত নেতিবাচক দুর্নীতিকে আশ্রয় করেছেন– কোনো বই সম্বন্ধেই মন্দ বলেন না তাঁরা, এবং কোনো বই সম্বন্ধেই কিছুই বলেন না। বাকি রইলেন লেখক সম্প্রদায়—এঁদের ভালো - মন্দ লাগার তীব্রতা ভীরুতা হরণ করে, এবং সাহিত্যরচনায় বহুদিনের অভ্যাস আত্মবিশ্বাস আনে; তাই দেখা যায় যে সমকালীন সাহিত্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যা - কিছু বলা হয়েছে তার বেশির ভাগ বলেছেন লেখকরা নিজেরাই।'

এই দুঃসাহসিক কাজে বুদ্ধদেব বসু অনুপ্রেরণা হিসেবে পেয়েছিলেন মহান রবীন্দ্রনাথকেই। যিনি 'সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা'র মধ্যে দিয়ে কাজের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। 'সমালোচনাকে সাহিত্য ক'রে তুলতে পারলে মস্ত একটা সুবিধা এই যে পরবর্তী যুগে মতামতগুলি সেখানে আকর্ষিত হবে, তার মধ্যে সত্য প্রচ্ছন্ন থেকে মনকে নাড়া দেবে সুন্দর, তাই কোনো কালেই তা ব্যর্থ হবে না।' কালের পুতুল নিজেই তার সফল উদাহরণ।

কালের পুতুল বইটিতে মোট পঁচিশটি প্রবন্ধ। বই-কেন্দ্রিক আলোচনা তেরোটি। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী —প্রত্যেকর সম্পর্কিত রচনা তিনটি করে; প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত দুটি, নজরুল ইসলাম - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - বিষ্ণু দে - সমর সেন - সুভাষ মুখোপাধ্যায় - অন্নদাশঙ্কর রায় আলোচিত হয়েছেন একটি করে প্রবন্ধে; আলোচিত হয়েছেন নিশিকান্ত - ফাল্গুনী রায় - সুকুমার সরকারের মতো কবিরা, যাঁরা প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন বাংলা কবিতায়, কিন্তু পূর্ণতা পাননি; এছাড়া রয়েছে লেখার ইস্কুল, কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন রায়, কালের পুতুল, কবিতার কুড়ি বছর—শিরোনামের রচনা। সবমিলিয়ে এমন একটি বই যেখানে আলোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা হয়েছে অত্যন্ত সফলভাবে।

জনরব রয়েছে যে, জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান বুদ্ধদেব বসুর। কথাটি সর্বাংশে সত্য বলে না মানলেও এ-কথা মানতেই হবে যে, জীবনানন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু সর্বদাই ছিলেন উচ্চকিত, তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে যেন জীবনানন্দ বঞ্চিত না-হন সেজন্য দীর্ঘদিন এককভাবে সংগ্রাম করে গেছেন বুদ্ধদেব বসু। কালের পুতুল ধারণ করে আছে জীবনানন্দের প্রতি বুদ্ধদেব বসুর অপরিসীম মুগ্ধতার প্রকাশ রয়েছে, তেমনই রয়েছে তাঁর কবিতার ও কবিবৈশিষ্ট্যের সঠিক চেহারাকে চিনিয়ে দেওয়ার আকুল প্রচেষ্টা। বুদ্ধদেব বসুর মতে— 'আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁরর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর।' জীবনানন্দের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সেই কবিকে দেখতে পান, আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে যে চিরকালের কবিকে হঠাৎ মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়; যার দেশ নেই, জাতি নেই, মানুষের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থান - পতন পার হয়ে যার সুর আজকের মতো কোনো এক বসন্ত - প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে আঘাত করে, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ী অনুভূতিকে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে— 'কয়েকজন সজীব ও সক্রিয় কবি আছেন, যাঁদের ঝোঁক বলশালী উচ্চারণের দিকে, কঠিন উজ্জ্বলতার দিকে, মিতব্যয়ী শব্দপ্রয়োগের দিকে। এঁদের ছন্দও তাই কানে - কানে - টানা ধনুকের ছিলার মতো টান, কোনোখানে একটি ঢিলে হবার জো নেই। মাথা খাটিয়ে এঁরা কবিতা লেখেন এবং সেই শ্রম ধরা পড়লে লজ্জিত হন না। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম, তথ্যবহ ও শাস্ত্রজ্ঞানসাপেক্ষ এবং সর্বোপরি নানা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ও পরিভাষায় আকীর্ণ করতে এঁরা কুণ্ঠিত নন; রচনাবিন্যাসে অন্যমনস্কতারই কোনো প্রশ্রয় নেই এঁদের কাছে।' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সেই ধরনের কবি।

বিষ্ণু দে সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব প্রায় অনুরূপ। এই দুই কবির কিছু কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর অকপট স্বীকারোক্তি যে, তিনি সেগুলি ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু তবু এসব কবিতা তাঁকে বারবার পড়তে হয়। বুদ্ধদেব বসুর মানে হয়, এই কবিতাগুলি ধ্বনি নির্ভর, এদের কাছে অর্থের প্রত্যাশা না করাই উচিত। বুদ্ধদেব বসু কখনো কখনো এ-ও ভাবেন—'কবিতা যে আমাদের এমনভাবে অভিভূত ও আলোড়িত করে সে তার ধ্বনিরই প্রভাবে, অর্থগৌরবে নয়। কবিতা যে কখনো পুরনো হয় না, কখনো ফুরোয় না, কয়েকটি আপাতসামান্য শব্দের সমাবেশ থেকে যে এক অন্য ভাবমণ্ডল উৎসারিত হয়, তার কারণ কি প্রধানত ধ্বনি নয়? ছন্দোবন্ধন নয়?' সেই ধ্বনির অসামান্য প্রয়োগের কারণেই বুদ্ধদেব বসুর মতো, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কবিতা অনন্য।

সমর সেন 'উর্বশী' কবিতায় দ্বিধান্বিত উচ্চারণ করেন : তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে/ দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো?/ কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে/ হে ক্লান্ত উর্বশী,/ চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে/ উর্বর মেয়েরা আসে;,

বুদ্ধদেব বসু দ্বিধাহীন চিত্তে সমর সেনের শক্তিমত্তাকে স্বীকার করে নেন আঙ্গিকের ঐশ্বর্যের কথা বলে— 'এখানে এটা বিশেষ করে উল্লেখ্য যে তাঁর গদ্য - ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়।'

সমর সেনের মানস-প্রবণতাকে চিহ্নিত করতেও ভুল করেন না বুদ্ধদেব বসু— 'নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, আর বিধাতাকে, অভিশাপ দেবার জন্যও, কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেনি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বাইরের, আত্মবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ - স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী - স্বার্থের বিরোধ। সৌন্দর্যের শত্রু, তাঁর মতে, মানুষের আত্মার কলুষ নয়, সামাজিক দুর্ব্যবস্থা। তাকে মেরেছে ধনিকের লোভ, নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে পঙ্কিল করেছে স্থূল, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, তাকে বিক্ষত করেছে আধুনিক জীবনের বণিক - সভ্যতার ব্যভিচারী প্রতাপ — এক অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান মানবজীবনের ভারসাম্য গেছে নষ্ট হয়ে। এখানে সৌন্দর্য আসবে কেমন করে?' কিন্তু তাই বলে সমর সেন যেন নিজের ভেতরের ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে ভুলে না যান, সে -কথাও মনে করিয়ে দেন বুদ্ধদেব বসু। আবার সমর সেনের কবিতায় একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনের আভাস দেখতে পেয়ে আনন্দিত হন বুদ্ধদেব বসু। পৃথিবীতে সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত প্র্যাকটিকাল ইয়ং ম্যানের সংখ্যাবৃদ্ধি। এরা আসলে হিসাবী ও সুবিধাবাদী হয়ে থাকে। তাদের ধিক্কার জানিয়ে বুদ্ধদেব বসু লেখেন— 'জীবনের যে ঋতুতে অসম্ভবের কুঁড়ি ধরার কথা, তখনই যারা মুনাফার হিশেব করতে বসে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। নিষ্প্রাণ চাকরি, ব্যবসাদারি বিয়ে, কর্মজীবনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা—মোটের উপর এমন একটি স্থাবর ও ক্ষীণদৃষ্টি মনোভাব, যা জীবনের যে-কোনোরকম বিকাশের প্রতিকূল। আমাদের দেশে যেন যৌবনই নেই; আমরা বুড়ো হ'য়ে জন্মাই, যদিও সাধারণত বুড়ো না-হ'য়েই মরি।'

স্বপ্নালোচিত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে পাঠকের সামনে প্রাপ্য গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন একমাত্র বুদ্ধদেব বসুই। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, বাংলা কবিতা যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই এই আশ্বাস পেয়েছিল যে, আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলেন এই আশ্বাস যে, পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার জাত যায় না। সর্বোপরি পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি। বুদ্ধদেব বসু আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রতিভূ, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাটি জেগে উঠছে, কিন্তু ঠিক ঠিক পথটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই যতীন্দ্রনাথের গুরুত্ব ক্রান্তিকালের কবিদের সকল বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় মর্মান্তিক কিছু সত্যভাষণ বুদ্ধদেব বসুর সকল গ্রন্থেরই পৃষ্ঠায় বিরাজ করে। কালের পুতুল তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন! ব্যতিক্রম হয়ও-নি। আমাদের দেশে রবীন্দ্র - বন্দনার পেছনে সাহিত্যের চেয়ে অসাহিত্যিক কারণগুলিই যে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, সে - কথা বুদ্ধদেব বসুর আগে কেউ এত সাহস নিয়ে বলতে পারেনি— 'যে রবীন্দ্রনাথ কবি, লেখক, সাহিত্যিক, তিনি খুব বেশী লোকের উৎসাহের বিষয় নন; যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বংশে না জন্মাতেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনে যুক্ত না হতেন, বিশ্বভারতী স্থাপন না করতেন, জগদ্বিখ্যাত না হতেন, এবং—এটাই কম কথা নয়—তাঁর কায়াকান্তি যদি দেবতুল্য না - হ'তো, তাহলে কি ধনপতিরাই তাঁর নামে প্রণাম করতেন না কি গণপতির উন্মুখতাই তাঁকে পুতুলপুজোর ছুতো ক'রে তুলতো?'

প্রমথ চৌধুরীর প্রতি আমাদের পাঠক ও পণ্ডিত সমাজের অবহেলার কারণ হিসেবে যে-কথাগুলি বলেছেন বুদ্ধদেব বসু, সেকুলিও মর্মান্তিক। প্রচারক, সাংবাদিক আর সাংবাদিক-কবির এই দৌরাত্ম্যের জগতে প্রমথ চৌধুরীর মতো মনীষাকে সহ্য করা সাধারণ বাঙালির পক্ষে কোথায় অসম্ভব। গণ মাপের বাঙালির কাছে তিনি বড্ড বেশি মেধাবী ছিলেন। তাই তাঁকে বিস্মৃতির অতলে পাঠিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে বাঙালি।

[চার]

'রসের ক্ষেত্রে কিছুই প্রমাণ করা যায় না, কিছুই প্রমাণ করবার নেই। চৈত্রের দুপুরে যে-কবিতা প'ড়ে মুগ্ধ হলাম, কোনো এক শ্রাবণের বৃষ্টি - ঝরা - রাত্রে সে-কবিতা বোবা হ'য়ে রইল। অবসরের শ্রান্ত অপরাহ্নে যে-লেখা মনকে ছুঁতে পারলো না, কোনো -এক উদ্ব্যস্ত বেলা - দশটায় ট্রাম ধরবার জন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ তারই দুটি লাইন মনে প'ড়ে দাঁড়াতে হ'লো থমকে।' অর্থাৎ সাহিত্যে সবকিছুই আপেক্ষিক; সৌন্দর্যও আপেক্ষিক। কিন্তু এখানেই থেমে থাকেন না বুদ্ধদেব বসু। কেন না চিরন্তন এক সৌন্দর্যবোধের ধারণা তাঁর মন জুড়ে সবসময়ই বিরাজমান—'ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, যুগের বৈশিষ্ট্য অসংখ্য বিচিত্র মতামতের সংঘর্ষ, রুচির অজস্র জঙ্গমতা—এই সমস্ত অতিক্রম ক'রে মানুষের সৌন্দর্যবোধ, মানুষের আনন্দচেতনা কিছু - একটা চিরন্তন নিশ্চয়ই আছে, নয়তো সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা কিছুই সম্ভব হ'তো না।'

সেই চিরন্তনই হচ্ছে কালের কষ্টিপাথর। বুদ্ধদেব বসু দাঁড়িয়ে আছেন কালের কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে। চিনিয়ে দিচ্ছেন কাচ ও কাঞ্চনের ফারাক।